সেতু

আজ ভারতের চুয়াত্তরতম স্বাধীনতা দিবস। এই লেখা যখন লিখছি বাইরেটা ঘন কালো হয়ে এসেছে, সকাল বেলাতেই। কেমন মনে হল, এই অন্ধকার আজ বড়ো প্রাসঙ্গিক। রূপকও বটে। চারপাশে ঘনায়মান রাজনৈতিক ও সামাজিক কালিমা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এভাবেই অসময়ে পরিব্যপ্ত। উদ্ধার নেই। শম্ভু মিত্রের চাঁদ বেনের ভাষায় বলতে গেলে – "সারা দেশে নেতা নাই"। এ-কথা অতিরঞ্জিত হবে না মোটেই যদি বলি, "সারা পৃথিবীতে নেতা নাই"। অথচ এই স্খলন যে আমাদের জ্ঞাত ছিল না তা নয়। রোগ যখন শরীরে বাসা বাঁধে তখন রোগী টের পান নিশ্চিত, উপেক্ষা না-করলে তা সময়েই দূর করা যায়। এখানেও তাই। ব্রেজনেভের সময়ের যে স্খলন রাশিয়াকে ভেঙে দিল স্তালিনের সময়েই কি তার সূচনা হয় নি? ঐতিহাসিকরা কী বলেন? ডিসিপ্লিন জিনিসটা তো ওপর থেকে নামে। যাদের দেখে আমরা ভিত্তিহীন রাজনীতির চাষ করলাম [প্র্যাকটিস কতটা করলাম, কে জানে!], তাঁদের স্খলন দেখে শিখলাম শুধু কিভাবে স্খলিত হতে হয়। শিখলাম না, কিভাবে সেই পাপের স্খালন হবে। আর যাঁরা প্রকৃত স্বপ্নাভিলাষী, যাঁরা অন্তত দেখতে চেয়েছিলেন সত্যিকারের বিপ্লব, আনতে চেয়েছিলেন নতুন সকাল, তাঁদের অমলকান্তি রোদ্দুর ধীরে ধীরে ঢেকে গেল অকাল বাদলে।

সে বড়ো যন্ত্রণার অভিযোজন। বাইরেটা একটু একটু করে পালটাতে থাকবে, আর ভেতরটা ক্রমাগত একই থেকে যাবার জন্য লড়ে যাবে। আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে এই লড়াইটাই সত্য, আর তাই লড়াইটাকে মেনে নেওয়া মানে প্রকারান্তরে সেই পালটে যাওয়ার প্রক্রিয়াকেই মেনে নেওয়া। তাই এক নিরন্তর 'কম্প্রোমাইজ'-এর ঘরে নিজেকে বন্দি করে রাখা ছাড়া টিকে থাকার আর কী-ই বা পথ! আমরা অনেকেই সেই পথই ধরেছি। তবুও কিছু মানুষ সেই পথের প্রান্তে নিজ নিকেতনে জ্বালিয়ে রেখেছেন দীপ, তাই বেঁচে থাকা তাঁদের অনেকটাই অমলিন। তেমন এক মানুষের গল্প বলব আজ।

সেটা সম্ভবত ১৯৮৯ সালের ৩ জানুয়ারি। সকাল ১০.৪০ হবে। মফস্বলের এক এঁদো স্কুলের প্রাঙ্গনে প্রার্থনার জন্যে ছেলেরা সারিবদ্ধ। শিক্ষকরাও টিচার্স রুমের বারান্দায়, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গাইতেন। জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনা শেষ হবার পরে পিটি হত। সেদিন প্রার্থনার পরে সবাই এক মূহুর্ত চুপ। হঠাৎ সামনের লাল শান বাঁধানো উঁচু বারান্দা থেকে খুব নরম স্বরে প্রধান শিক্ষক বললেন – "গতকাল ভারতীয় থিয়েটারের অন্যতম প্রাণপুরুষ সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী সফদর হাসমি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় চার পিরিয়ডের পরে হাফ ছুটি হয়ে যাবে।" ছেলেদের তো মহা মজা। সবাই হাফ-ছুটি পেয়ে গোকুলদার পাঁপড় আর বনকুল খেতে খেতে যথারীতী

নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু একটা ছেলের মনে চোরকাঁটা বিঁধে রইল। থিয়েটারের লোক মারা গেলে স্কুল ছুটি হয়? বাড়িতে এসে মাকে বলল। মাও লোকটাকে চিনতে পারল না। কিন্তু লোকটা ভেতরে কেমন করে যেন গেঁথে গেল। তখন গুগল ছিল না, জানার এতো প্রকরণও ছিল না চারিধারে। তাই প্রশ্নটা ধীরে ধীরে মনের টেবিলে অনেক নিচের ফাইলে জমা পড়ে রইল। তারপর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এসে সব এলোমেলো করে দিল।

বছর ছয়েক পরে, ছেলেটা 'অভিনেতা' হবার বাসনাতেই থিয়েটার করতে যাবে। তখন আরেকজন শিক্ষক, কণক রায়ের মুখে আবার শুনবে সফদরের নাম। পুরনো ফাইল ধুলো ঝেড়ে আবার সামনে উঠে আসবে। একের পর এক প্রশ্ন উন্মুক্ত করবে রাষ্ট্র, রাজনীতি, সময় ও সফদর প্রসঙ্গ। জানতে পারবে, থিয়েটারে রাষ্ট্র বিরোধিতা করার অপরাধে তরুণ সফদরকে গুলি করে মেরেছে ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ। কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। ইন্দিরার সঙ্গে 'গান্ধী' শব্দটা বড়োই অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। আর মনে পড়ে যায় সেই ক্লাস সেভেনে, এক শীতের সাদা সকালে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথা, যিনি প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন থিয়েটারের সঙ্গে, রাজনীতীর সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, রাষ্ট্রের বেনিয়মের সঙ্গে।

হেডস্যারের স্মৃতি বলতে এর বেশি আমার কাছে যা আছে তা নিতান্তই 'আর্কিটাইপ'। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী [ইন ফ্যাক্ট, ধুতি-পাঞ্জাবীতে এমন স্মার্ট মানুষ আমি খুব কম দেখেছি], পকেটে একটা নীল কালির ও একটা লাল কালির পেন থাকত। একদিন হয়ত লাল কালির কলমটা লিক করেছিল, বুকপকেটের কাছে যেন রক্ত জমেছিল। পান খেতেন খুব, ঠোঁট-দুটো লাল টুকটুকে হয়ে থাকত। ভারী চশমার পেছনে চোখদুটো ছিল সম্মোহনী। যখন পড়াতেন, চোখের দিকে তাকালেই শেষ। কেমন যেন আটকে যেতাম। কিছুক্ষণ পরে ঘুম পেত। তাই একটু পেছনে বসতাম। ঘণ্টা পড়ে যাবার পড়েও পড়িয়ে যেতেন। কানের একটা সমস্যা ছিল তো, কম শুনতেন। এমন সময় মানুষ সাধারণত উঁচু স্বরে কথা বলে। কিন্তু আমরা কোনদিন হেডস্যারকে চিৎকার করতে শুনি নি। ছেলেরা দৌরাত্ব করলে একবার বারান্দায় দাঁড়ানোই কাফি। এমন অনেক সময় হত, কোনও একজন স্যার আসেন নি, আমরা সেই সুযোগ নিচ্ছি। হেডস্যার একবার ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেলেন; বা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, যেখান থেকে সব ঘরগুলো দেখা যায়। অনির্বচনীয় শান্ততা নেমে আসতো। তাঁকে শাসন করার জন্য কোনোদিন বেত হাতে নিতে দেখি নি [অন্য শিক্ষকদের কাছে 'কর্পোরাল পানিশমেন্ট'-এর অনেক ভয়ংকর নমুনা পেয়েছি]। বাংলা সাহিত্যের অসামান্য বুৎপত্তি থাকা স্বত্তেও কোনোদিন প্রাইভেট টিউশুনি করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর চাহিদা সামান্যই ছিল – দুবেলার একটু ডাল-ভাত-মোটা কাপড়, আর অনেকখানি পড়াশোনা। তাই তখনকার সামান্য বেতনেই তিনি সবটা মানিয়ে নিতে পারতেন। 'সিম্পল

লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং'-এর এই চিত্রটা তখনকার অনেক মানুষই বহন করতেন, আজ যা বিরল দৃষ্টান্ত।

এই সামান্যই ! একটা মানুষ সম্পর্কে, কিংবা বলা ভালো, নিতান্তই এক ছাত্রের কাছে একজন শিক্ষকের থেকে-যাওয়া ছবি। কিন্তু স্মৃতি কত লম্বা সেটা প্রয়োজনীয় নয়, কতটা কাছের, কতটা কাজের, কতটা অনুপ্রেরণাদায়ী সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন যে-বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তিনি, হয়ত নিজের অজান্তেই, তাই আমার ভেতরে আজ ডালপালা মেলেছে, আকাশ ছুঁতে চাইছে। আমার অজান্তেই তিনি হয়ে আছেন আমার প্রথম নাট্যশিক্ষক, সমাজশিক্ষক – সেদিন সবার অলক্ষেই সেতু হয়ে তিনি আমার সঙ্গে জুড়ে দিলেন সফদরকে, থিয়েটারকে, সময়কে - ভাবলে রোজ রোজ কৃতজ্ঞতায় আনত হই।

এরপর কাজের চাপে, নিজেকে 'অকিঞ্চিৎকর' থেকে 'মূল্যবান' করার তালে অনেক বছর কেটে যাবে। এঁদো স্কুল কেঁদো হবে। ছেলেটিরও একটু নাম-টাম হবে। একদিন, নীল চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে পড়বে সেই এঁদো স্কুলের কথা, লাল রঙের বারান্দায় দাঁড়ানো এক হেডস্যারের কথা। কেমন আছেন এখন? এখনও পান খান? এখনও শিশুর মত হাসেন? জানবার ইচ্ছে উদগ্র। কোথায় যেন শিকড়ে টান পড়ে। সে জানে, পালটে গেছে সব - বন্ধুরা, রাস্তাঘাট, জল-জমিন, হাতের ওপর হাত – তবু যিনি পালটাবেন না কোনোদিন, যিনি এই অভিযোজনে বিশ্বাসী নন, যাঁর কাছে ফিরে আসতেই হয় - তাঁকে একবার দেখে আসা খুব জরুরি। ডানার সঙ্গে শেকড়ের সেটাই তো বোঝাপড়া।

২০১৮ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল। যখন জানলেন, ওনার হাত ধরেই আমার সফদরকে চেনা, আশির্বাদ করেছিলেন। আমি নিজের লেখা নাটকের বই দিলাম। বললেন, তাহলে আমিও তোমায় আমার লেখা একটা বই দিই? বইটার নাম, কার্ল মার্ক্স - মহাজীবন কথা। মার্ক্সের এতো প্রাঞ্জল সহজ জীবনী এর আগে পড়ি নি। এখন মনে হয়, সে তো হবেই। সহজ মানুষ সহজ মানুষের সহজতার কথা লিখবেন - এ আর বিচিত্র কী ! হেডস্যার তো সহজই ছিলেন।

একাদিক্রমে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন স্কুলে বা অন্যত্র বয়সে কাঁচাদের সঙ্গে থিয়েটার করতে গিয়ে আমারও ছাত্রসংখ্যা দুনিয়াজুড়ে প্রায় হাজারখানেক তো হবেই। অনেকে এখন আবার আমার থেকেও বেশি 'এডুকেটেড' হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সফল। এরা আমার গর্বের একটা অংশ। পাঠদানকালে একটা জিনিস আমার কাছে অন্তত পরিস্কার হয়ে গেছে – আমরা 'শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক' সম্পর্কে একেবারেই অশিক্ষিত [আরও অনেক কিছু সম্পর্কেও]। প্রকৃত শিক্ষক ও প্রকৃত বন্ধু – এদের

দুজনের সম্পর্কেই আমাদের যে ধারণা বিদ্যমান তা সবিশেষ ভুল। এটা যুগ-যুগান্তর ধরে আমরা বহন করে চলেছি। কিন্তু শিক্ষককে প্রকৃতরূপে গ্রহন করলে তিনি আসলে বন্ধু হয়ে যান, আর বন্ধু তখনই বন্ধু হবেন যদি তিনি প্রকৃত শিক্ষক হন – এই বোধ বোধ করি আমাদের 'কলচর'-এ খুব প্রাঞ্জল নয়। সত্যি বলতে কি, আমাদের শিক্ষকরাও এতে খুব সম্মত হবেন না [রবি ঠাকুর বলেছেন, শিক্ষক নিজের অযোগ্যতা ঢাকতে ছেলেদের বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখেন], কারণ, তাতে ছাত্রদের সম্ভ্রমের বাঁধে ফুঁটো হতে পারে, পরীক্ষার আগে সাজেশন নামক বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল প্রজন্ম করে তাদের আর গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু পিটার স্লেড বা অ্যানাতোলি লুনাচারস্কি বা পাওলো ফ্রেইরি প্রমুখের পাঠে যে অভিজ্ঞান, তা বলছে শিক্ষক আর ছাত্র আসলে পরস্পরের বন্ধু, আসলে তাঁরা উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। কেউ-ই কারোর থেকে উঁচু 'স্টেটাস'–এ বিলং করেন না; কারণ, একজন ছাড়া অপর জনের অস্তিত্বই নেই।

আমাদের হেডস্যার কি এই বিশ্বাসে প্রত্যয়ী ছিলেন কিনা জানা নেই। সে-সুযোগ আর কোনোদিনই ঘটবে না। কিন্তু আমাদের স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে সামান্য হলেও এক প্রকার বন্ধুত্ব ছিল, তা আমি আর কোথাও বিশেষ দেখি নি। যে-সব স্কুলে যাই দেখি ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত এক একটা অ্যাকাউন্ট, কখনও কখনও মার্কেটও বটে। তাই অতিরিক্ত তোয়াজ। বিড়ি খেয়ে [বা আরও গর্হিত অপরাধে] ধরা পড়লে গার্জিয়ান কল, গার্জিয়ানকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লক্ষীপূজার আয়োজন অব্যাহত রাখা। আমাদের স্কুলে আবার অন্য রকম হত - আগে ধোলাই হত, পরে দেখা যেতো ক্লাসের সেইসব বিড়িখোর বখে-যাওয়া ছেলেরাই ছুটির পরে স্যারদের সঙ্গে ভলি খেলার চান্স পাচ্ছে [সেইসব 'ব্যাকবেঞ্চারদের' আমি সারা জীবন হিংসে করে যাব]। শুধু তাই নয় 'ভালো প্লেয়ারদের' টিমে রাখা নিয়ে তাঁদের রীতিমতো ঝগড়া করতে দেখেছি। এ-ঘটনা হেডস্যার জানতেন না, তা হতে পারে না [যা চেঁচামেচি হত, গোটা পাড়া শুনত]। কিন্তু এটা তিনি প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন অনাবিল। এখানে যেন কোথাও আমি একটা গণতান্ত্রিক সেতু দেখতে পাই। হয়ত আমার দেখার ভুল। কিন্তু এই ভুল আমায় একটা স্নান দেয়, আমি ভালো থাকি।

সেদিন রহড়ায় গিয়ে আমি পথ হারিয়েছিলাম। অনেকদিন পরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু রাস্তাঘাট, দোকানপাট সব এভাবে বদলে যাবে, ভাবতে পারি নি। অভিযোজন যে কতদূর বুঝলাম হেডস্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে। ওপথে সাইকেল নিয়ে কেটেছে কত বিকেল। এক নাম-না-জানা মেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতো, আমি প্রায়ই তাকে দেখতে যেতাম। সেসব এক কবিতার মত বিকেল। তার ছিল নীল নীল চোখ। কোনোদিন আমি ডেস্পারেট হয়ে জোর বেল দিতাম সাইকেলে। একদিন সে হঠাৎ তাদের সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল। একেবারে সামনে। আমি খুব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছিলাম। সে-

দেখাই শেষ দেখা। ২০১৮র ৪ ফেব্রুয়ারি সেই রাস্তায় আমি খুঁজে মরি সেই সদর দরজা, সেই ছাদ। সব বদলে গেছে। সব মুখ ঢেকে গেছে উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে। শেষে লোককে জিজ্ঞেস করে আমায় পথ খুঁজে পেতে হয়।

যদিও পথ কেটে নিলেই পথ মেলে। এখন আকাশ অনেকটা পরিস্কার হয়ে এসেছে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে বিশ্বাস আর স্থির রাখা যাচ্ছে না। যাঁর স্মৃতিচারণ করতে বসেছি, মনে হয়, লিখতে লিখতে তাঁর কথা, তাঁর ছবি এতবার মনে এসেছে বলেই হয়তো সব কালো মুছে যাচ্ছে। আজীবন যিনি সাম্যবাদের সঙ্গে, মুক্তচেতনার সঙ্গে, সঠিক রাজনৈতিক বোধের সঙ্গে ঘর করলেন – তাঁর কথা লিখতে গিয়ে মনের মেঘ কাটবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সেই তো আমাদের জন্য 'জাগ্রত যে ভালো'। প্রত্যয় আমারও এখন দৃঢ়তর হচ্ছে যে "মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য"।

ছবি থেকে আরেক নাতিদীর্ঘ শিক্ষক স্যার চার্লস চ্যাপলিন যেন বলছেন, "লুক আপ হানা, দ্য ক্লাউডস্ আর লিফটিং...

রাজা ভট্টাচার্য
১৫ আট ২০২০